শতাব্দীর চুক্তি নাকি বহু শতাব্দীর ক্রুসেড?

পর্ব - ০৬

শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ

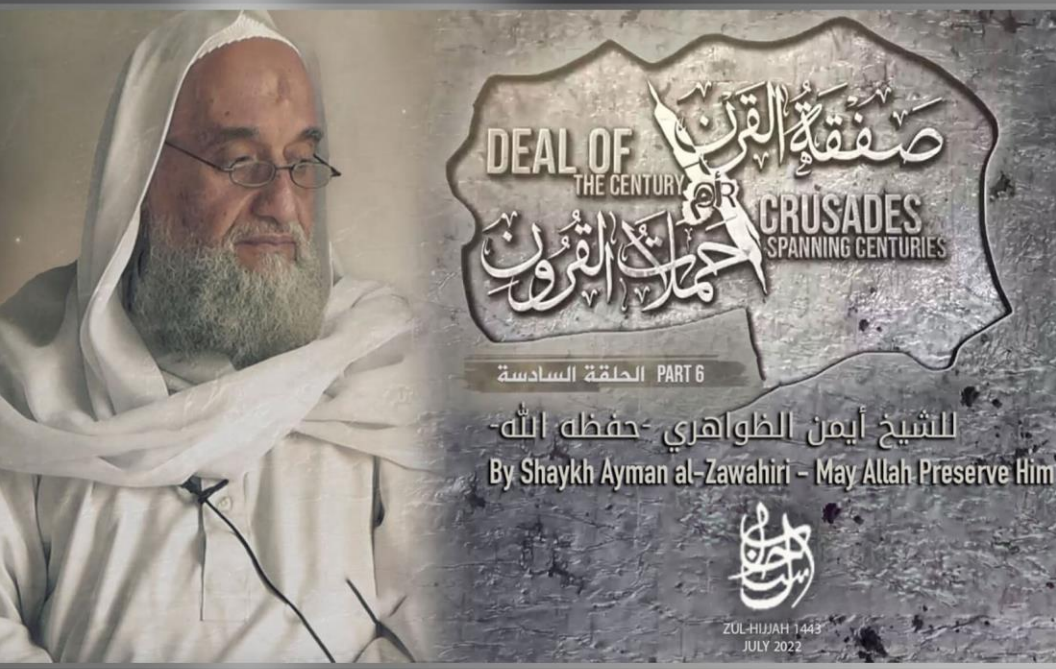

النصر
AN-NASR

শতাব্দীর চুক্তি
নাকি
বহু শতাব্দীর ক্রুসেড?

পর্ব – ০৬

শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহ

AN-NASR

-মূল প্রকাশনা সম্পর্কিত কিছু তথ্য-

মূল নাম:

صفقة القرن أم حملات القرون (6) (الحلقة السادسة) – للشيخ أيمن الظواهري – حفظه الله

ভিডিও দৈর্ঘ্য: ২২:৫৮ মিনিট

প্রকাশের তারিখ: জিলহজ্ব, ১৪৪৩ হিজরি

প্রকাশক: আস সাহাব মিডিয়া

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه

সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবার, সাহাবায়ে কেরাম এবং তার সকল অনুসারীদের উপর।

সমগ্র পৃথিবীর মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

এটি "শতাব্দীর চুক্তি নাকি বহু শতাব্দীর ক্রুসেড" সিরিজের ষষ্ঠ পর্ব। পূর্ববর্তী পাঁচটি পর্বে আমি সংক্ষিপ্তভাবে ইসলাম ও ক্রুসেডের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কতিপয় প্রধান দিক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি ক্রুসেডারদের মোকাবেলা করার সম্ভাব্য কিছু পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি। আমি আরও উল্লেখ করেছিলাম যে, বুঝার সুবিধার্থে এই আলোচনাকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হবে।

প্রথমত: দাওয়াত ও সচেতনতার জিহাদ।

দ্বিতীয়ত: প্রতিরোধ জিহাদ এবং শত্রুকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জিহাদ।

আমি 'দাওয়াত ও সচেতনতার জিহাদ' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি আরও উল্লেখ করেছিলাম, যেহেতু এই আলোচনাটি বেশ বড় তাই বিষয়টিকে সংক্ষিপ্ত ও সহজ করার উদ্দেশ্যে কয়েকটি পয়েন্টের ভিত্তিতে আলোচনা করা হবে। আমরা ধারাবাহিক ভাবে নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলোর উপর আলোকপাত করব ইনশা আল্লাহ।

-সচেতনতা তৈরির জিহাদ

-উম্মাহর তরবিয়ত ঠিক করার জিহাদ

-দাওয়াতের লড়াই

-রাজনৈতিক জিহাদ

-(উম্মাহর) ঐক্যের গুরুত্ব

আমি উত্তম চরিত্রের বিকাশ তথা উম্মাহর তরবিয়ত ঠিক করার জিহাদ নিয়ে আলোচনা করেছি। আর আজ দাওয়াতের ময়দানের মেহনত নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

শুরুতে আমি একটি কথা বলতে চাই - ইতিপূর্বে আমি আমার বক্তব্যগুলোতে সকল মুসলিম ভাই-বোন ও সমগ্র উম্মাহকে সম্বোধন করেছি। আজ আমি বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহের সেই সচেতন অগ্রবর্তী দলকে সম্বোধন করছি - যারা উম্মাহের বেদনাদায়ক বাস্তবতাকে পরিবর্তন করার জন্য চেষ্টা করেন এবং যারা দাওয়াতের এই কাজটি বহন করাকে নিজেদের গুরুদায়িত্ব মনে করেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দাওয়াত একটি বিরাট দায়িত্ব এবং এর আলোচনাও অনেক দীর্ঘ। আমি এখানে সংক্ষেপে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট উল্লেখ করতে চাই, যে বিষয়গুলোর দিকে ইসলামি দাওয়াতি আন্দোলনকে সর্বদা চোখ রেখে চলতে হবে। বিশেষ করে ইসলামী দাওয়াতি আন্দোলনের ঐ দল, যারা মুসলিমদের বিরোধীশক্তি ও "শতাব্দীর চুক্তি"র পরিকল্পনাকারী ইহুদিবাদী ক্রুসেডার জোটের মোকাবেলা করতে চায়।

আমি শুরুতেই বলতে চাই - আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে সর্বকালে পৃথিবীতে ইসলামী দাওয়াহ ছিল প্রধানত - তাওহীদের প্রতি দাওয়াত। আর 'শতাব্দীর চুক্তি'র প্রতিরোধ ও শত বছর ধরে আমাদের বিরুদ্ধে চলমান ক্রুসেডের প্রতিরোধসহ জীবনের প্রতিটি দিকই এই তাওহীদের দাওয়াতের মাঝে অন্তর্ভুক্ত। তাই 'শতাব্দীর চুক্তির' বিরুদ্ধে আমাদের এই দাওয়াতি যুদ্ধে সর্বপ্রথম 'তাওহীদের আকিদার প্রতি দাওয়াত' দেয়ার এবং এই আকিদাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে।

বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, ইবাদতের ক্ষেত্রে, বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে চাওয়ার ক্ষেত্রে এবং বিচার চাওয়ার ক্ষেত্রে - সৃষ্টিকারী, রিজিক ও জীবন মৃত্যুদানকারী একমাত্র আল্লাহর কাছেই সকল কিছু চাইতে হবে। তাওহীদের এই আকিদার দিকে সকলকে আহ্বান করতে হবে।

এই আকীদাকে রক্ষা করতে হলে, বর্তমান সময়ে এই আকিদার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। যাতে তাওহীদের আকীদাকে রক্ষা

করা সম্ভব হয় এবং জিহাদ থেকে বাধাদানকারী সংশয়গুলোর মিথ্যাচার উন্মোচন করা সম্ভব হয়।

তাওহীদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শত্রু হচ্ছে – জাতীয়তাভিত্তিক দেশ, জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত আন্তর্জাতিক নীতি, নাস্তিকতা, মুনাফিক ও দালাল তৈরিকরণ, স্বৈরাচারনীতি, সামরিক দখলদারিত্ব এবং খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতকরণ। তাওহীদের বিপরীতে এসকল কার্যক্রম এখন একসাথে সকল মুসলিম জনপথে চলমান।

তাই আমি প্রথমত জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা নীতি নিয়ে আলোচনা পেশ করছি।

জাতীয়তার ভিত্তিতে দেশ পরিচালনা নীতি এমন একটি আদর্শ ও আকীদা - যা উম্মাহকে খণ্ড-বিখণ্ড করে পঞ্চাশেরও অধিক রাষ্ট্রে বিভক্ত করেছে। জাতীয়তাবাদের মতো ঘৃণ্য আদর্শের বীজ মুসলমানদের অন্তরে রোপণ করার জন্য পশ্চিমা ক্রুসেডার জোট তাদের সর্বশক্তি দিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের চাওয়া – উম্মাহ যেন তাদের হারানো শক্তি পুনরায় ফিরে না পায় এবং শতাব্দীর পর শতাব্দি তারা দাস হয়ে থাকে।

অথচ কিছুদিন পূর্বে এই উম্মাহ বিশ্বের অধিকাংশ ভূখণ্ড বিজয় করে ইসলামের দাওয়াতকে চীন থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল। এই জাতি পূর্বেই আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ক্রুসেডার পশ্চিমাদের নিকৃষ্ট মতাদর্শের অসারতাকে প্রমাণ করেছে। এই বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে বটে, তবে এটি সে বিষয়ে আলোচনা করার জায়গা না।

এখানে আলোচনার প্রধানতম বিষয় হচ্ছে - জাতীয়তাবাদী ক্রুসেডার। চাই তারা পূর্ব ইউরোপের হোক অথবা পশ্চিমের আমেরিকা হোক। এই ক্রুসেডাররা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য, নিজেদের রাজত্ব-প্রতিপত্তি, আকীদা-বিশ্বাস, নিয়ম-নীতি ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে মুসলিম উম্মাহকে হুমকি মনে করছে। তাই তারা এই 'জাতীয়তাবাদী' মতবাদের মাধ্যমে মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এই জাতীয়তাবাদী মতবাদের অনুসারীরাই মুসলিম উম্মাহকে পঞ্চাশেরও অধিক দেশে বিভক্ত করেছে। এভাবে তারা আরও ভাগ করতেই থাকবে। গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ দেশগুলো মুসলিম উম্মাহর ঐক্যকে ধ্বংস করছে। এরা প্রকাশ্যে অন্যায় পদ্ধতিতে ও গোপনীয় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে এই উম্মাহর ঐক্যকে তছনছ করে দিচ্ছে। একতাবদ্ধ হয়ে মুসলিমদের সাথে শত্রুতা করছে, যুদ্ধ করছে এবং এই ঐক্যকে নষ্ট করার জন্য গোপনে ও প্রকাশ্যে সকল প্রকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয়তাবাদের আদর্শে গড়ে উঠা তথাকথিত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর ইতিহাস - বিশ্বাসঘাতকতা আর খেয়ানতের ইতিহাস। যায়নবাদী আরবদের মধ্য হতে হোসাইন ইবনে আলী[১] এবং তার উত্তরসূরি ফয়সাল[২] দুজনেই সর্বপ্রথম

---

[১] সাইয়্যিদ হুসাইন বিন আলী (১৮৫৪ - ৪ জুন, ১৯৩১)। ১৯০৮ সাল থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত মক্কার শরীফ ও আমির ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ১৯১৬ সালে তিনি ব্রিটিশদের সহযোগিতায় উসমানীয় সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহের সূচনা করেন। । ইহুদিদের ফিলিস্তিনের ফিরিয়ে আনার পক্ষপাতী ছিল এই শরীফ হুসাইন। সে বলেছিল –

"এই দেশের সম্পদগুলো এখনও অব্যবহৃত। ইহুদি অভিবাসন দেশের সম্পদের বিকাশ ঘটাবে"।

[২] আবদুল আজিজ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ফয়সাল ইবনে তুর্কি ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আল সৌদ (১৫ জানুয়ারি ১৮৭৬ – ৯ নভেম্বর ১৯৫৩)। তিনি আধুনিক সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা ও সৌদি আরবের প্রথম বাদশাহ।

আবদুল আজিজ প্রথম আরব শাসক, যে ইহুদিদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে মেনে নিয়েছিল। সে ফিলিস্তিন বিষয়ে বলেছিল –

أنا السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل السعود أقر وأعترف ألف مرة للسير برسي كوكس مندوب بريطانيا العظمى؛ لا مانع عندي من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود أو غيرهم كما ترى بريطانيا التي لا أخرج عن رأيها حتى تصيح الساعة

“আমি সুলতান আব্দুল আজিজ বিন আব্দুর রহমান ফয়সাল আস-সউদ। আমি হাজার বার গ্রেট ব্রিটেনের স্যার পারসি কক্স এর প্রতিনিধিত্বকে স্বীকার করছি। দরিদ্র ইহুদিদেরকে বা অন্যদেরকে ফিলিস্তিন দিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি কোনো প্রতিবন্ধকতা দেখছি না, যেমনটি আপনি ব্রিটেনের বেলায় দেখতে পান। আর আমি এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসব না যদিও সময় ক্রন্দন করে বলতে থাকে”। (তারিখে আলে সাউদ-৯৫১)

তার উপদেষ্টা এবং ব্রিটিশ সহকারী জন ফেলবি তার সাথে কৌতুক করে বলেছিল, “হয়তো এই স্বাক্ষরই ফিলিস্তিন থেকে সমগ্র ফিলিস্তিনি জনগণের স্থানচ্যুতি সৃষ্টি করবে।”

আবদুল আজিজ তখন অট্টহাসি হাসা অবস্থায় বলেছিল-

ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে ফয়সাল ও ইসরাইলের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি 'চাইম ওয়াইজমেন' (Chaim Weizmann) মধ্যকার একটি চুক্তি[৩]র মধ্য দিয়ে ইসরাইলকে এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

হুসাইন ইবনে আলী, তুর্কি খেলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আরব দেশগুলোকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে দেশ গঠনের আহ্বান করে। যদি সে সত্যিকারার্থে খেলাফাতে উসমানীর ভুল সংশোধন করতে চাইতো, তাহলে তাদেরকেই (খেলাফাতে উসমানীর নেতৃত্বকে) আহ্বান করতো। কিন্তু সে তা না করে, জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আরব দেশের ভিত্তিস্থাপন করার আহ্বান করে। কুর্দি কলোনি স্থাপনের মতো করে অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দেশের ভিত্তিস্থাপন করার জন্যে নতুন নতুন পথ আবিষ্কার করে। শুধু তাই নয়, আরব জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক দেশের ভিত্তি স্থাপন করার সময় তারা তালিকা থেকে মিশর, মরোক্কোসহ অধিকাংশ আরবদেরকে বাদ দিয়েছে। এর কারণ হচ্ছে, তার ইংরেজ প্রভুরা তাকে যতটুকু নিয়ে আরব জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠনের অনুমতি দিয়েছে, সে ততটুকুই করেছে।

تريد أن أغضب بريطانيا لأن عددًا من أهل فلسطين سيشرد؟ أهل فلسطين لا يستطيعون حمايتي إذا لم تحمني بريطانيا من الأعداء، ولتحرق فلسطين بعد هذا

"তুমি কি চাও আমি ব্রিটেনকে ক্ষেপীয়ে তুলি, কেননা কিছু ফিলিস্তিনিকে বিতাড়িত করা হয়েছে? ফিলিস্তিনিরা আমার সাহায্য করতে পারবে না যখন ব্রিটেন আমাকে শত্রুদের থেকে সাহায্য না করবে। অতঃপর ফিলিস্তিনকে পুড়িয়ে ফেলা উচিত।" (আহলুল হারামের জাগরণে খাইরুল উমামের নেতৃত্ব - তৃতীয় পর্ব - সৌদি রাজপরিবারঃ ফিলিস্তিনের বিক্রেতারা - শাইখ হামজা বিন উসামা হাফিজাহুল্লাহ – আন নাসর মিডিয়া – পৃষ্ঠা - ৫)

[৩] ফয়সাল ইবনে হুসাইন শরীফ হুসাইনের ছেলে। ১৯১৯ সালের ৩ রা জানুয়ারি 'প্যারিস শান্তি সম্মেলনে সে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী চাইম ওয়াইজমেন এর সাথে একটি চুক্তি করে। এটি ফয়সাল-ওয়াইজমেন চুক্তি নামে পরিচিত। বেলফোর চুক্তির উপর ভিত্তি করে এই চুক্তি করা হয়। এই চুক্তির ৪ নং ধারায় বলা হয় –

"ইহুদিদের বিপুল পরিমাণে ফিলিস্তিনে নিয়ে আসার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ফিলিস্তিনে আসার পর তাদেরকে স্থায়ী বাসিন্দা করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ যথা সম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে নেয়া হবে"।

এরপর ইহুদীরা ফিলিস্তিনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। আব্দুল আজিজ আল সৌদ ব্রিটিশদের সহায়তা, অস্ত্র ও বুদ্ধি ব্যবহার করে নাজদ[৪] ও হেজাজের[৫] কর্তৃত্ব কেড়ে নেয়। অন্যদিকে ফ্রান্স, সিরিয়া ও লেবানন দখল করে। এভাবেই এই আরব দেশগুলো বিভিন্নভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে হুসাইন ইবনে আলী সমগ্র আরব জুড়ে জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র গঠনের পথ উন্মুক্ত করে। এ কাজে পশ্চিমারা তাকে সর্বাত্মক সহায়তা করেছিল। কিন্তু আখেরী বাস্তবতা হচ্ছে - ইংরেজরা তাদের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেনি। বরং পশ্চিমা ক্রুসেডাররা হুসাইন ইবনে আলীর উত্তরসূরিদের নিজেদের স্বার্থে বছরের পর বছর ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে শরীফ হুসাইন ইবনে আলী ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে[৬]।

এটি সুস্পষ্ট যে, জাতীয়তাবাদী দেশ মানেই হচ্ছে – ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্বীকার করা এবং শরীয়তের বিচার ব্যবস্থাকে অস্বীকার করা। কেননা দেশের জনগণ সবাই যদি একই ধর্ম-বিশ্বাসকে[৭] লালন না করে তাহলে তারা কখনো ধর্মকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হতে পারবে না। তাই স্বদেশের প্রতি সম্মান ও স্বদেশপ্রেমকে সর্বোচ্চ পরিচয় হিসেবে তুলে ধরে তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা হয়।

জাতীয়তাবাদী দেশের আরেকটি দিক হচ্ছে - ধর্মকে সংবিধানের উৎস না বানিয়ে অধিকাংশ ব্যক্তির অভিমতকে আইন প্রণয়নের উৎস বা সংবিধানের মূল হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সবাইকে একত্রিত করার মাধ্যমে সবার

---

[৪] সৌদি আরবের মধ্যাঞ্চল হলো নাজদ (**نجد**)। দেশের এক-তৃতীয়াংশ জনগণ এখানেই বাস করে। রিয়াদ, আল কাশেম এবং হাইল এলাকা নিয়ে নজদ অঞ্চল গঠিত।

[৫] হেজাজ (**اَلْحِجَاز**) হেজাজ হল বর্তমান সৌদি আরবের পশ্চিম অংশ। এর পশ্চিমে লোহিত সাগর, উত্তরে জর্ডান, পূর্বে নজদ ও দক্ষিণে আসির অবস্থিত।

[৬] আরব বিদ্রোহের শুরু থেকে ব্রিটিশরা হুসাইনকে সমর্থন করলেও পরবর্তীতে সৌদি আক্রমণ ঠেকানোর ব্যাপারে কোনো সাহায্য করেনি। ফলে সৌদিরা মক্কা, মদীনা ও জেদ্দা দখল করে নেয়। তাকে সাইপ্রাসে পালাতে বাধ্য করা হয়।

[৭] একটি দেশে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ থাকে। এদেরকে ধর্মের ভিত্তিতে একত্রিত করা সম্ভব না। তাই 'জাতীয়তাবাদ' নামক ধর্ম আবিষ্কার করা হয়েছে। এই ধর্মের ভিত্তিতে দেশের সকলকে একত্রিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

মাঝে ঐক্য তৈরি করা হয়। যেমনটি ড. আবদুল ওয়াহহাব আল-মাসরি[৮] বলেছেন: 'জাতীয়তাবাদ' প্রত্যেককে নিজেদের ধর্মীয় পরিচয়-বৈশিষ্ট্য থেকে বেরিয়ে এসে দেশাত্মবোধের ভিত্তিতে বন্ধুত্বের আহ্বান জানায়। 'ধর্মীয়'গণ্ডি থেকে বের হয়ে আসা জাতীয়তাবাদের একটি বিশেষ শর্ত"।

'ধর্মনিরপেক্ষতা' মূলত একটি ধর্মহীনতামূলক মতবাদ। এটি প্রতারণামূলক একটি মতবাদ। কারণ ধর্মত্যাগ দুভাবে হয় -

ক. সরাসরি অস্বীকারের মাধ্যমে

খ. ইসলামের বিপরীত মতামতকে বিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করা্র মাধ্যমে।

উভয়টিই ধর্মত্যাগের মাধ্যম। উভয়টির ফলাফল একই।

ধর্মনিরপেক্ষতার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে - রাষ্ট্র থেকে ধর্মকে পৃথক করা। ধর্মনিরপেক্ষতার দাবি হচ্ছে - ধর্ম রাষ্ট্রের অধীনে থাকবে। রাষ্ট্র ধর্মের অধীন হতে পারবে না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিজয়ী শক্তিগুলোর মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে জাতীয়তা ভিত্তিক দেশের ধারণা বিস্তৃতি লাভ করে। বিজয়ী শক্তিগুলো ইসলামবিরোধী শক্তি ছিল। তাই আমরা দেখতে পাই, আজও এসকল জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের মাধ্যমে ঐসব বিজয়ী শক্তিকে খুশি রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছে।

ইসলামবিরোধী কার্যকলাপকে বৈধতা দেয়ার জন্য এসকল রাষ্ট্র ইসলামের নামে এবং মুসলিমদের নামে বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে। আর চিন্তাগত ও রাজনৈতিক অধঃপতনের কারণে এসব প্রতিষ্ঠান এমন সব ফতোয়া প্রকাশ করে, যা শুনে শরীর ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠে। আপনি লক্ষ করলে দেখতে পাবেন, তাদের কারো কারো ফতোয়া হচ্ছে এমন - মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য

[৮] ড. আবদুল ওয়াহহাব আল মাসরী একজন মিশরীয় স্কলার ছিলেন। ইহুদীবাদ ও পশ্চিমা বিশ্ব নিয়ে তার বিশেষ আগ্রহ ছিলো। তিনি এ বিষয়ে বেশ কিছু প্রবন্ধও তৈরি করেছিলেন। শাইখ আইমান আয যাওাহিরী হাফিযাহুল্লাহর 'একসাথে আল্লাহর দিকে' সিরিজে ড. আবদুল ওয়াহহাব আল মাসরীর বামপন্থী চিন্তাধারা থেকে পুনরায় ইসলামে প্রত্যাবর্তন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

মার্কিন সৈন্যদলে মুসলিমরা যোগ দিতে পারবে! কেউ কেউ ফতোয়া দিচ্ছে - খেলাফত থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

কেউ কেউ ফতোয়া দিচ্ছে - বর্তমানে জাতীয়তাবাদী দেশগুলোই হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্রের মূল কাঠামো; যদিও তা ছোট হতে হতে মানচিত্রে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে যায়। আবার কারও ফতোয়া হচ্ছে - মুসলিমদেরকে তাদের শাসকের আনুগত্য করতে হবে, যদিও শাসকরা টেলিভিশনে প্রকাশ্যে ব্যবিচারে লিপ্ত হয়। কারও ফতোয়া হচ্ছে, ইসরাইলের সাথে সন্ধি করা জায়েজ এবং বাইতুল মাকদিস ভ্রমণ করার জন্যে ইসরাইলের ভিসা নেয়া জায়েজ। কারও ফতোয়া হচ্ছে - উসামা রহিমাহুল্লাহ সহ যারা আলে-সৌদের বিরোধিতা করে তারা হচ্ছে বিশৃঙ্খলা ও নাশকতার ইন্দনদাতা। কারও ফতোয়া হচ্ছে - শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা জায়েজ নাই, যদিও সে কুফুরি করে। কারও ফতোয়া হচ্ছে - মিসর সহ অন্যান্য দেশে নিকৃষ্ট কুফুরি শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা হারাম। কারও ফতোয়া হচ্ছে - ফেতনার আশংকা থাকলে যুদ্ধের ময়দানে বের হওয়া জায়েজ নেই। কারও ফতোয়া হচ্ছে - বিক্ষোভ মিছিল করা হারাম; কেননা তা আল্লাহর জিকির থেকে অমনোযোগী করে। কারও ফতোয়া হচ্ছে, কুয়েতকে স্বাধীন করার জন্যে ক্রুসেডার বাহিনীকে আমন্ত্রণ জানানো যাবে। এই ধরণের আরও বহু ফতোয়া তারা দিয়ে যাচ্ছে।

যেমন আহমদ শাওকী বলেন: [৯]

কবিতা

فلتسمعن بكل أرض داعيا

يدعو الغى الكذاب أو لسجاح

ولتشهدن بكل أرض فتنة

فيها يباع الدين بيع سماح

[৯] আহমাদ শাওকী ছিলেন মিশরের একজন বিখ্যাত কবি ও আরবী সাহিত্যিক। মৃত্যু ১৯৩২।

يفتى على ذهب المعزوسيفه

وهوى النفوس وحقدها الملحاح

অর্থঃ

প্রতিটি ভূমিতেই তোমরা এমন কিছু আহ্বানকারী পাবে * যারা মিথ্যা, প্রতারণা ও প্রবৃত্তির দিকে আহ্বান করে।

এবং প্রত্যেক ভূমিতে এমন ফিতনা দেখবে * যেখানে স্বল্পমূল্যে দ্বীনকে বিক্রি করা হচ্ছে।

ব্যক্তির ক্ষমতা, সম্পদ ও প্রবৃত্তির দিকে লক্ষ করে ফাতাওয়া দেয়া হয়।

বহু আগে আল্লামা জুরজানী রহিমাহুল্লাহ বলে গেছেন-

কবিতা

ولم أقض حق العلم إن كنت كلما

بدا طمع سيرته لي سلما

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم

ولو عظموه في النفوس لعظما

ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا

محياه بالأطماع حتى تجهما

অর্থঃ

আমি সত্যিকারের আলেম হতে পারবো না, যদি আমি আমার লোভ-লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে ইলমকে মাধ্যম বানাই।

যদি আলেমরা ইলমের আমানতের হিফাজত করতো, তাহলে ইলমও তাদের হেফাজত করতো।

আর যদি তারা ইলমের সম্মান বজায় রাখতো, তাহলে ইলমের মাধ্যমে তাদেরকে সম্মান রক্ষা করা হতো।

কিন্তু তারা ইলমকে অপমান করেছে, তাই তারা অপদস্থ হয়েছে, অপবিত্র হয়েছে।

তারা ইলম চর্চা করেছে লোভ-লালসার জন্য, ফলে ইলম বিকৃত হয়ে গেছে।

খেলাফত ব্যবস্থার পতন, ধর্মনিরপেক্ষতার উত্থান এবং মুসলিম ভূখণ্ডকে জাতীয়তাবাদী মতবাদের ভিত্তিতে ভাগের অমঙ্গলের ফলেই এসব কিছু হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী ধর্মনিরপেক্ষবাদী ক্রুসেডাররা তাদের ইচ্ছামতো ইসলামী বিশ্বকে ছিন্নভিন্ন করে অসংখ্য ভাগে বিভক্ত করেছে। তাদের নির্দেশেই রাষ্ট্রগুলোর স্বরাষ্ট্রনীতিতে জাতীয়তাবাদী আদর্শের গোড়াপত্তন হয়। এটাকেই রাষ্ট্রনীতি বলা হয়। আর এই জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনীতিকে সর্বাত্মকভাবে সুসংহত করেছে জাতিসংঘ।

পশ্চিমা ধারার মিডিয়া এবং শিক্ষা সিলেবাসের মাধ্যমে জাতিয়তাবাদী মতবাদের প্রতি বারবার আহ্বান করা হচ্ছে। ফলে মন্দ জিনিষ ভালো জিনিষের রূপ নিয়েছে। আর একই খেলাফতের শান্তির ছায়ায় উম্মাহর ঐক্যের আহ্বান অপছন্দনীয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বরং তা দুর্লভ এবং অপরিচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

বিষয়টি এখানেই থেমে থাকেনি। বরং এই জাতীয়তাবাদী মতবাদ দেশে দেশে নামধারী ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে আসন গেড়ে বসেছে। এসব ইসলামী আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত অধিকাংশ ব্যক্তিবর্গ মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করে ঐক্যের আহ্বান করে আসছে। প্রয়োজনে বিশ্বাসঘাতক, জন্মভূমি বিক্রিকারী ও পশ্চিমাদের এজেন্টদের সাথে ঐক্য করছে।

এদের অনেকেই ভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। শুধু তাই নয়; বরং এরা ধর্মনিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের অনুসরণ অনুকরণ করা এবং তাদের সাথে সখ্যতা তৈরির ব্যাপারে এরা খুবই আগ্রহী!

কিছু কিছু দল পশ্চিমাদের সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে এমনভাবে প্রতিযোগিতা করছে যে, এক পর্যায়ে তাদের সন্তুষ্টিকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উপর প্রাধান্য দিচ্ছে। আর একাজকে

তারা তাদের দেশের স্বার্থ রক্ষা হিসেব গণ্য করছে। আপনারা একটু খেয়াল করলে এর বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবেন।

আপনারা আরও দেখতে পাবেন, কেউ কেউ আপনাকে উপদেশ দিবে - পশ্চিমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য পশ্চিমাবিরোধী মুসলিমদের থেকে সম্পর্কচ্ছেদ করার। তারা আপনাকে বলবে, 'শুধু নিজ মাতৃভূমি নিয়েই থাকুন। নিজেদেরকে নিয়েই ভাবুন। অন্যদেরকে নিয়ে ভাবার প্রয়োজন নেই'। আর এভাবেই একটু একটু করে দিনকে দিন এই সীমানা সংকীর্ণ হয়ে আসছে।

আর কারো কারো বক্তব্য হচ্ছে, 'আমরা অন্যদের চেয়ে পৃথক। আমাদের সাথে কারো সম্পর্ক নেই। না এদের (ডানপন্থীদের) সাথে, না ওদের (বামপন্থিদের) সাথে'। ভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে তাদের কারো কারো অবস্থা এই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তাদেরকে না দেশের জনগণ গ্রহণ করে, আর না জাতীয়তাবাদীরা গ্রহণ করে। ফলে এদের দ্বারা মাতৃভূমি বিক্রিকারী বিশ্বাসঘাতকদের সাহায্য ছাড়া আর কিছুই হয় না।

আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে, তথাকথিত কিছু ইসলামী আন্দোলনের দাঈ ও কর্মীদের অনেকে উগ্র জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ নিয়ে গর্ব করে। আপনি তাদেরকে প্রাচীন জাহিলিয়্যাতের সাথে সম্পৃক্ত ভাবাবেগ প্রকাশ করতে দেখবেন। এটা কেমন নিকৃষ্ট ব্যাপার যে, মুসলিমরা জাতীয়তাবাদের নামে পূর্বের জাহিলিয়্যাতের ন্যায় হুবল, লাত ও উয্যার জাতীয়তাবাদের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে এবং তা নিয়ে গর্ব করে?!

শত শত বছরের ক্রুসেড আক্রমণের মোকাবেলায় আমাদের দাওয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হবে - গণতান্ত্রিক ও জাতীয়াবাদী আদর্শ ধারণ করা ও মেনে নেয়ার ক্ষতি, ভয়াবহতা মানুষের সামনে স্পষ্ট করা। জনসম্মুখে এ মিথ্যা ও বিশৃঙ্খলার মুখোশ উন্মোচন করা। পাশাপাশি খেলাফত আলা মিনহাজিন নাবুওয়্যাহ প্রতিষ্ঠার লক্ষে মুসলিমদেরকে একটি সুদৃঢ় ঐক্যের দিকে আহ্বান করা।

ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক দেশের বিপরীতে আমাদেরকে কোরআনে বর্ণিত নববী খেলাফতকে পেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে – আমরা যে খেলাফতের চিত্র উপস্থাপন করবো সেটা যেন ভ্রান্ত খেলাফতের চিত্র

না হয়। মিথ্যা, জুলুম, রাগ, তাকফির, হত্যা ও ধারণার ভিত্তিতে যে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয় এমন খেলাফতের চিত্র আমরা উপস্থাপন করবো না। আবার খেলাফতের চিত্র যেন এমন একনায়কতন্ত্র রাজত্বের মতোও না হয়, যা মুসলিমদের মাঝে ঐক্যের পরিবর্তে অনৈক্য সৃষ্টি করে।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদের মোকাবেলার জন্য দাওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে, ইলহাদের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করা। কারণ মানুষ দ্বীনের ক্ষেত্রে শুধু অস্বীকার ও বিরোধিতার মাঝে ইলহাদকে সীমাবদ্ধ করেছে। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতাও একপ্রকার ইলহাদ। ইতিপূর্বে আমি এই বিষয়টি উল্লেখ করেছি।

ইলহাদের মোকাবেলায় আমাদেরকে দুটি বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে বলে আমি মনে করি।

প্রথমত, ইলহাদের (ধর্মত্যাগের) বিভিন্ন কারণ রয়েছে। কখনো কখনো সেটি হয়ে থাকে রাজনৈতিক কারণে। যেমন লেবাসধারীর আদলে নকল ধর্ম পেশ করার মাধ্যমে সে মূলত দ্বীনকে অস্বীকার করে।

দ্বিতীয়ত : চারিত্রিক অধ:পতনের মাধ্যমে। যেমন চারিত্রিক অধ:পতনের প্রতি ঝোঁক থাকা এবং ধর্মের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত থাকার মানসিকতা। এই কারণটি অধিকাংশ নাস্তিকদের ধর্মত্যাগের পিছনের মূল কারণ। যদিও সবাই এমন না।

ড. আবদুল ওয়াহহাব আল মাসরি এই চারিত্রিক অধঃপতনের বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তার দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার আলোকে এটাকে পেশ করেছেন।

কখনো কখনো ইলহাদের পিছনের কারণ হচ্ছে, শক্তিশালী দাওয়াত এবং উত্তম আদর্শের অনুপস্থিতিতে সৃষ্টি হওয়া কিছু সংশয়। সাহসিকতার সাথে এই বিষয়ের সাক্ষ্য দিয়েছেন উস্তায আদেল হুসাইন রহিমাহুল্লাহ।

ইলহাদের প্রচারের পিছনে ক্রুসেডারদের রাজনৈতিক টার্গেট হচ্ছে - উম্মাহর শক্তির উৎস 'আকীদা-বিশ্বাস' থেকে উম্মাহকে বিচ্যুত করা। আমেরিকার "র‍্যান্ড কর্পোরেশন" কতৃক প্রকাশিত বইয়ে তা স্পষ্টভাবে এসেছে। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে, "বিনাউ শাবাকাতিন ইসলামিয়্যাতিন মু'তাদিলা" বইয়ে তারা বিষয়টি উল্লেখ করেছে। তেমনি "আল ইসলামুল মাদানী আদ-দিমিকরাতিয়্যী" বইয়েও

এটা উঠে এসেছে। সেখানে তারা স্পষ্ট বলেছে যে, আমেরিকার কর্তব্য হলো: মৌলিবাদীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে ফেলা।

এখানে এটি জোর গলায় বলা যায় যে, যারাই মুসলিমদের সারিতে এবং মুজাহিদদের সারিতে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে, এরা নিশ্চিত ইসলাম বিরোধী ক্রুসেডারদের স্বার্থে এবং আমেরিকার এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষে কাজ করে।

তাই উম্মাহর সচেতন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কর্তব্য হল - দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধর্মহীন এই সাম্রাজ্যবাদী ক্রুসেডারদের যুদ্ধের বিরুদ্ধে, দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের মোকাবেলা করা। শত্রুরা উম্মাহর ইমান-আকীদা ধ্বংস করা ও রাজনৈতিকভাবে উম্মাহকে দুর্বল করার জন্যই ইলহাদের বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা করছে।

যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর জন্য খালেস করে নিয়েছে এই ধর্মহীনতার মোকাবেলা তার পক্ষে খুবই সহজ। তবে নিজেকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করার পর নিজের মাঝে দৃঢ় মনোবল, প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়তা ও ইখলাস থাকতে হবে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক যে রাষ্ট্রব্যবস্থা আছে সেটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ীরাই তৈরি করেছে। এই রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে তারা পুরো বিশ্বকে, বিশেষত মুসলিম উম্মাহকে নিজেদের গোলাম বানিয়ে রাখতে চায়। তারা এটা করছে পুরো বিশ্বের উপর জাতিসংঘ নামক প্রতিষ্ঠানের নিয়ম নীতি চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। অথচ এই প্রতিষ্ঠানটি নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্বের বড় বড় ৫ জন শীর্ষস্থানীয় অপরাধী দেশ।

আন্তর্জাতিক এই রাষ্ট্রব্যবস্থাই বৈশ্বিক ক্রুসেড যুদ্ধের প্রথম দুর্গ স্বরূপ ইসরাইল রাষ্ট্রের সূচনা করেছে। চীন-কে পূর্ব তুর্কিস্তান দখল করার সুযোগ করে দিয়েছে। ভারতকে কাশ্মীর দখলের, স্পেনকে সেউটা ও মেলিলা দখলের, রাশিয়াকে মুসলিম কাওকায দখলের সুযোগ করে দেয়। এটাই সেই বিশ্বব্যবস্থা, যা আফগানিস্তান ও ইরাকে ক্রুসেড আক্রমণের সুযোগ করে দিয়েছে।

সুতরাং আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রব্যবস্থা নামে উম্মাহর বিরুদ্ধে তাদের এই ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের কথা সকলের কাছে স্পষ্ট করা - আমাদের উপর একান্ত কর্তব্য। সেইসাথে চলমান জুলুম, নির্যাতন, স্বৈরাচার ও পাপাচার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও চারিত্রিক নিকৃষ্টতার মোকাবেলা করাও উম্মাহর ইসলামী দলগুলোর কর্তব্য।

একটা বিষয় আমাদেরকে সবসময় ভালোভাবে মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম কখনো কোন অন্যায় ও জুলুমের অনুমতি দেয় না। এমনকি কোন মুসলিম যদি কোন কাফেরের উপর জুলুম করে তাও ইসলাম মেনে নেয় না। সুতরাং প্রতিটি মুসলিমই অন্যায় ও জুলুমের প্রতিহতকারী। তাই এটা কল্পনাও করা যায় না যে, কোন মুসলিম অন্যায়, অনাচার, হারাম, স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিদ্রোহের দিকে আহ্বানকারী হবে। এটাও সম্ভব নয় যে, কোন মুসলিম রোম পারস্যের মতো কোন কুফরী রাষ্ট্রের আহ্বায়ক হবে।

ইমাম ইসমাইলী রহিমাহুল্লাহ তার সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন: মারওয়ান ছিল মদিনার গভর্নর। মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পরিবর্তে তার ছেলে ইয়াজিদকে গভর্নর বানাতে চাইলেন। তাই মারওয়ানের নিকট এই বিষয়ে একটি চিঠি লেখে পাঠান।

তখন মারওয়ান একটি সমাবেশে লোকদের উপস্থিত করে খুতবা দিয়ে ইয়াজিদের কথা উল্লেখ করলেন এবং সকলকে তার হাতে বায়আত দেয়ার আদেশ করে বললেন, "আল্লাহ তায়ালা আমিরুল মুমিনীনকে ইয়াজিদের মাঝে কল্যাণ দেখিয়েছেন। আর আমিরুল মুমিনীন কাউকে গভর্নর নিযুক্ত করার অর্থ হল; আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক তাকে গভর্নর নিযুক্ত করা"। মারওয়ানের এই কথা শুনে আব্দুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: 'এটাতো রোম সম্রাটদেরই প্রথা'।

এই জন্য ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'একই বংশের হওয়ার কারণে কেউ কোন রাষ্ট্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার অধিকারী হতে পারে না। তাইতো সাহাবায়ে কেরাম ঐ বিষয়টি ভালোভাবে দেখেন নি যে, তিনি (মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিজ সন্তানের জন্য বাইয়াত নিয়েছেন। আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: 'তোমরাতো রোম সম্রাটেরই অনুসরণ করছ। তোমরা তাদের মত নিজ সন্তানদের জন্য বাইয়াত নিচ্ছ'।

অনেক সাহাবী এমনকি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা এই বিষয়টি জানতে পারলেন। কিন্তু কিছুই বললেন না। এর থেকেই সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নিজ সন্তানের জন্য পরবর্তী শাসক হওয়ার বাইয়াত নেয়া রোম পারস্যেরই রীতি। বিপরীতে

ইসলামের রীতি হল, উম্মাহর জন্য কল্যাণকামী একজন যোগ্য ও উপযুক্ত ব্যক্তিকেই শাসকের জন্য মনোনয়ন করা। এটাই ইসলাম ও মুসলিমদের রীতি। আর বিপরীতটাই হল রোম ও পারস্যের নীতি।

অথচ নব উদ্ভাবিত তথাকথিত খেলাফতের পদ্ধতি হচ্ছে আবুল মুলসিম, আবুল মুকাম্মিম, আবুল মুফলি, আবুল মুকনি, আবুল মুবারকি, আবুল মুলাফলিফ, আবুল মুতখাফি, আবুল মুজাহহি এমন অপরিচিত ব্যক্তিদের বাইয়াতের মাধ্যম। যাদের পরিচিত ও ইতিহাস সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে তাদের ব্যাপারে এতটুকু জানা যায় যে, তারাও তাদের পূর্বসূরিদের মতো মিথ্যা, গাদ্দারী, মুসলিমদের গালমন্দ, তাকফীর ও হত্যার পূর্বের চিত্রের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো; এই বাইআতের ভিত্তি হচ্ছে শুধুমাত্র জ্বালাময়ী কিছু ভাষণ। এরা বলে, আমরা কোন হত্যা ও বোমা হামলাকে পরোয়া করি না। এমন খেলাফতের বাস্তবতা - অনর্থক ও হাস্যকর।

আমাদের লক্ষ্য হলো - মুসলিমদের শাসন ক্ষমতা দখল করে থাকা গাদ্দার রাষ্ট্রপ্রধানদের মুখোশ উন্মোচন করা। তাদের ভ্রষ্টতা, জুলুম – নির্যাতন ও ইসলামী আকীদা থেকে তাদের বিচ্যুতির কথা স্পষ্ট করা। পাশাপাশি তাদের সহযোগী ও তাদের আনুগত্যের প্রতি আহ্বানকারীদের মুখোশ উন্মোচন করা। সর্বোপরি প্রত্যেক মাজলুমের আর্তনাদে সাড়া দেয়া।

দ্বিতীয়ত, যেই বিষয়টির প্রতি উম্মাহর প্রতিটি দাঈরই আগ্রহ থাকতে হবে এবং অন্যকেও তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে তাহলো - মুরতাদ ও কাফেরদের হাতে অধিকৃত মুসলিম ভূখণ্ডগুলো পুনরুদ্ধার করা। উম্মাহর সামনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, প্রতিবেদন ও রিপোর্ট পেশ করা। ক্রুসেডার কর্তৃক তাদের সৈন্যবাহিনী দিয়ে কিংবা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলিম ভূখণ্ডগুলো দখল করে রাখার বিষয়টি সকলের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে।

মুসলিম দেশগুলোতে আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, তুরস্ক, ইরান, আরব আমিরাত, চীন ও ভারতের সামরিক আগ্রাসনের বিষয়টি সকলের সামনে স্পষ্ট করতে হবে। পুরো বিশ্বময় ছড়িয়ে থাকা এই সেনাবাহিনীর ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের

বিষয়টি মুসলিমদের নিকট স্পষ্ট করতে হবে। উম্মাহর নিকট এই বিষয়টি ভালোভাবে স্পষ্ট করতে হবে যে, উম্মাহ এখনো শত্রুর দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। বরং তারা এক শত্রুর দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে অন্য এক শত্রুর দখলদারিত্বে আটকা পড়েছে। এই নতুন শত্রু অত্যান্ত নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রকারী, ধোঁকাবাজ ও প্রতারক।

উম্মাহর দাওয়াতি সংগঠনের জন্য জরুরী হলো - খ্রিস্টধর্ম প্রচারের ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করা। খ্রিস্টধর্ম প্রচারকে শুধু মুসলিমদের আকীদা নষ্ট করার চেষ্টা হিসেবে দেখা আমাদের জন্য উচিৎ নয়। বরং এটাকে বাস্তবতা থেকে উপলব্ধি করা উচিৎ। কারণ মুসলিম বিশ্বের উপর ক্রুসেড আক্রমণের পিছনে সকল মুসলিমকে ধর্মান্তরিত করাই তাদের মৌলিক উদ্দেশ্য। আর আন্তর্জাতিক গির্জা সংঘগুলো অনেকটা রাষ্ট্রের ন্যায়। এদের রয়েছে রাজনৈতিক সম্পর্ক, নিজস্ব সৈন্য বাহিনী এবং কিছু টার্গেট ও ইচ্ছা। যদিও তাদের মাঝে ও বড় বড় রাষ্ট্রগুলোর মাঝে কিছু বিষয়ে মতবিরোধও রয়েছে। এরপরও এই গির্জা সংঘটনগুলো মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে তাদের ক্রুসেড হামলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ।

খ্রিস্টধর্ম প্রচার বন্ধ করার অন্যতম মাধ্যম দুটি।

১. গির্জাবাসির আকীদা, বিশ্বাসগত বিকৃতি এবং ঈসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ তাওরাতের বিকৃতি করার বিষয়টি সকলের কাছে বর্ণনা করা।

২. গির্জার রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণনা করা। তাদের বিভিন্ন আন্দোলন ও কাজের পিছনে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের ইতিহাস বর্ণনা করা।

খ্রিস্টধর্ম প্রচার রোধ করে, মুসলিমদের ইমান ও আকীদা হেফাজতের আমলে নিয়োজিত মুজাহিদদের জন্য দোয়া করে; আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ তায়ালা এই ময়দানের অগ্রপথিক প্রিয় ভাই শাইখ রিফায়ী সুরুর[১০]কে উত্তম

[১০] শাইখ রিফায়ি সুরুর একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক। জন্ম মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে। মৃত্যু ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০১২ সালে। শাইখ সুরুর সালাফি জিহাদি আন্দোলনের প্রথম প্রজন্মের সদস্য। ১৯৮১ সালে সাদাত হত্যা মামালায় মিশর সরকার শাইখকে ৩ বছরের কারাদণ্ড দেয়। কারাদণ্ড শেষ হবার পর মিশর সরকার তাকে গৃহবন্দী করে রাখে।

বিনিময় দান করুন। কারণ তিনি তার জান, মাল, কলম ও বক্তৃতা - এক কথায় নিজের সর্বস্ব দিয়ে ইসলামের বিজয়ের জন্য আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করেছেন। আল্লাহ তাঁর ছেলে মহান দায়ী, মুজাহিদ, শহিদ ওমর রিফায়ী সুরুর[১১] এর প্রতি রহম করুন। খ্রিস্টধর্ম থেকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া তার স্ত্রী ও মেয়েকে ইয়াহুদীদের গোলাম সিসি সরকারেরর জুলুম এবং গির্জার হিংস্র পাদ্রিদের থেকে আল্লাহ তাদের হেফাজত করুন। আমিন।

আজ এখানেই সমাপ্ত করছি। আগামী অধিবেশনে জিহাদুদ দাওয়াহ বিষয়ে আলোচনা করার ইচ্ছা রয়েছে। ইনশাআল্লাহ।

জামাল আবদুল নাসেরের মুসলিম ব্রাদারহুডের উপর চালানো নির্মম নির্যাতনের দৃশ্য ছোট থেকে দেখেছেন। এই নির্যাতনের ঘটনা তাঁর অন্তরে ইসলামের দিকে ঝোঁকার তাড়না সৃষ্টি করে।

শাইখ সুরুর সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর লেখা দ্বারা খুব প্রভাবিত হন। সায়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহর এর ফাঁসি তার জন্য বিরাট এক ধাক্কা ছিল। এই ঘটনার পর শাইখ লেখালেখিতে মনোযোগ দেন।

The Companion of the Ditch - তার বিখ্যাত বই।

[১১] শহীদ উমর রিফায়ী সুরুর শাইখ রিফায়ী সুরুর রহিমাহুল্লাহর বড় ছেলে। জন্ম ১০ই জানুয়ারি, ১৯৭৬। মৃত্যু – ২০১৮ সালে। জিহাদি অঙ্গনে তাকে সবাই আবু আব্দুল্লাহ আল মাসরি নামে জানতেন।

আমেরিকা ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ করলে উমর সুরুর ইরাকে যাত্রার প্রস্তুতি নেন এবং অন্যদের উৎসাহিত করা শুরু করেন। এই কারণে তাকে আটক করা হয় এবং ৩ বছরের সাজা দেয়া হয়। সাজা শেষ হলে মুক্তির কিছুদিন পর আবার ২০০৯ সালে আটক হন।

২০১১ সালে জেল থেকে পালান। ২০১২ সালে পিতা শাইখ সুরুর ইন্তেকাল করেন। ২০১৩ সালের দিকে প্রথমে সিরিয়া পরে লিবিয়াতে হিজরত করেন। ২০১৮ সালের দিকে লিবিয়াতে উমর রিফায়ী সুরুর শহীদ হন।